জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য

সমস্যা ঃ

অধিকাংশই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেই কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে এবং ফলত তা সবসময় পৃথিবীর পরিবেশ ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক সম্পদের অতিমাত্রায় ব্যবহার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে বহু পরিবেশ ব্যবস্থায়ই আর পুনর্গঠনযোগ্য বা টেকসই থাকতে পারে না এবং এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই পরিবেশ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল মানুষ।

পরিবেশগত অবক্ষয়ের বিরূপ প্রভাব সবসময় তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না, যেমন- পাহাড়ী অঞ্চলে গাছ কাটার ফলে পাহাড়ী ঢল নামে। প্রায়শঃই পরিবেশ অবক্ষয়ের ফলাফল সমস্যার উৎস হতে বহু দূরে অনুভূত হয়। যেমন, শিল্পোন্নত দেশসমূহে গ্রীনহাউজ গ্যাসের নির্গমন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্র সমতল বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা সৃষ্টি করেছে।

মহাসাগর সমূহে স্বল্প সংখ্যক মাছই থাকুক বা খামারের জমির উপরিস্তরের মাটি ক্ষয়ে যাবার ফলে অপর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন হোক বা দূষিত জলধারা ও নদীসমূহ আর নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ নাই করুক- মূল কথা হলো, অবক্ষয়ের শিকার এই পরিবেশ ব্যবস্থা সমূহ বিশ্বব্যাপী দরিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষুধা ও রোগ ব্যাধির এক প্রধান নিয়ামক।

গুরুত্বপূন পরিসংখ্যান ঃ

- মরুকরণ বিশ্বের সামগ্রিক ভূমির প্রায় এক-চতুর্থাংশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে এবং বিশ্বের ৭০ ভাগ শুষ্কভূমি আরো অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে। প্রায়শই প্রান্তিক জমিতে অতিমাত্রায় পশুচারণ বা এর অতিব্যবহারের ফলে সৃষ্ট এবং গ্রামীন দরিদ্র্য ও ক্ষুধার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত এই মরুকরণ ১০০টি দেশের ১ বিলিয়নেরও বেশী লোকের জীবন-জীবিকাকে হুমকি গ্রস্ত করেছে।
- পাহাড় বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যার জন্যে সুপেয় পানি সরবরাহ করে থাকে ; তথাপি পাহাড়ী পরিবেশ ব্যবস্থা হিমবাহের গলন, বনায়ন ধ্বংস এবং অটেকসই পদ্ধতিতে ভূমি ব্যবহারের ফলে ঝুঁকি গ্রস্ত হয়ে পড়েছে।
- গত এক দশকে বিশ্বে ৯৪ মিলিয়ন হেক্টর বন ধ্বংস হয়েছে, আকারে যা ভেনেজুয়েলা অপেক্ষা বড়। ক্রান্তীয় এলাকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বনায়ন ধ্বংসের হার সবচেয়ে বেশী ; সেখানে গত এক দশকে ৪ শতাংশ বন ধ্বংস হয়েছে।
- মানুষের কর্মকান্ডের ফলে বিশ্বের উপকূলীয় পরিবেশ ব্যবস্থার অর্ধেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউরোপে এই অবক্ষয়ের পরিমাণ ৮০ শতাংশ এবং এশিয়াতে ৭০ শতাংশ।
- সমুদ্র দূষণের শতকরা ৮০ ভাগ ঘটে স্থল ভিত্তিক উৎসের মাধ্যমে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ৯০ শতাংশের অধিক ময়লা আবর্জনা এবং ৭০ শতাংশ শিল্পবর্জ্য ভূ-পৃষ্ঠ জলধারায় অপরিশোধিত অবস্থায় সরাসরি নিক্ষেপ করা হয়।
- মৎস্য আহরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন লোক জীবন যাপন করে। বিশ্বের মৎস্য সম্পদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্ধেক পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে, মৎস্যের ভবিষ্যৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে হলে বিশ্বের ৭৫ শতাংশ মৎস্য সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে আহরণ বন্ধ করতে হবে বা মৎস্য আহরণ হ্রাস করতে হবে।
- বিশ্বের প্রবাল প্রাচীরের প্রায় অর্ধেক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং আরো ২০ হতে ৩০ শতাংশ আগামী দশ বছরে ধ্বংস হয়ে যাবার হুমকির মধ্যে রয়েছে। মহাসাগরের খাদ্য আর্বতনে প্রবাল প্রাচীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস কার্বন-ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব শিল্প বিস্তার-পূর্ব পর্যায়ের প্রতি মিলিয়নে ২৭০ পার্টস অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি মিলিয়নে ৩৬০ পার্টস-এ দাড়িয়েছে। মানব কর্মকান্ডের ফলে সৃষ্ট এক-তৃতীয়াংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড এখন হতে ১০০ বছর অবধি বায়ু মন্ডলে বিরাজ করবে।
- ১৯০০ সাল হতে সমুদ্র সমতল ২০-৩০ সেমিঃ বৃদ্ধি পেয়েছে, বেশীর ভাগ মেরু অঞ্চল বহির্ভূত হিমবাহ সমূহ গলে যাচ্ছে এবং আর্কটিক সাগরের বরফের বিস্তার ও ঘনত্ব গ্রীষ্মকালে হ্রাস পাচ্ছে বলে জলবায়ু

পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেল (IPCC)-এর তথ্যানুযায়ী জানা যায়। এই প্যানেলের মতে প্রতি বছর ৪৬ মিলিয়ন লোক ঝড়ো জলোচ্ছাসের কারণে বন্যায় আক্রান্ত হয়। সমুদ্র সমতলের উচ্চতা ৫০ সেমিঃ বৃদ্ধি পেলে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াতো ৯২ মিলিয়ন ; সমুদ্র সমতল ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বন্যায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াতো ১১৮ মিলিয়নে।

- ২০০১ সালের সর্বশেষ IPCC-এর মূল্যায়নে প্রতিভাত হয় যে, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বদ্বীপ অঞ্চলসমূহ ১ মিটার সমুদ্র সমতল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। সমুদ্র উপকূল বরাবর দেয়াল নির্মাণের মতো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অভাবে মিশর ০.১ শতাংশ ভূমি হারাবে, নেদারল্যান্ড হারাবে ৬ শতাংশ ভূমি এবং বাংলাদেশ হারাবে ১৭.৫ শতাংশ ভূমি ও মার্শাল দ্বীপসমূহে তা ৮০ শতাংশ ভূমিই গ্রাস করে নেবে, যার ফলশ্রুতিতে বাসস্থান হারাবে দশ মিলিয়নের মতো মানুষ এবং নীচ ভূমির ক্ষুদ্র দ্বীপ দেশসমূহের ক্ষেত্রে পুরো দেশের মানুষই ভূমি হারাবে।
- ১১০০০-এর বেশী প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্তির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং ৮০০ প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ; এর প্রধান কারণ হলো তাদের আবাসস্থলের বিনাশ সাধান। বড় ধরনের প্রচেষ্টা পরিচালিত না হলে আরো ৫০০০ প্রজাতির প্রাণী গুরুতরভাবে হুমকিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

আমাদের করণীয় ঃ

একদিক দিকে দারিদ্র্যের কারণে পরিবেশগত অবক্ষয় সাধিত হয়, কারণ দরিদ্র জনগণ ও জাতিসমূহ দীর্ঘ মেয়াদী সম্পদ সংরক্ষণ অপেক্ষা স্বল্পমেয়াদী জীবন রক্ষাকারী চাহিদা মেটাতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ ব্যবস্থার অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে অটেকসই পন্থায় সম্পদের ব্যবহার যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হয়, যার ফলশ্রুতিতে প্রচুর পরিমাণ বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের গ্রাম অঞ্চলে দারিদ্র্য মোকাবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা একই সাথে সাধিত হয়। উত্তম ভূমি ব্যবস্থাপনা খাদ্যের স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করে। যেহেতু আফ্রিকায় সংগৃহীত কাঠের অর্ধেকই জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, উন্নততর জ্বালানীর উৎস সেখানে বন সংরক্ষণে সহায়তা করবে। বিশেষত দরিদ্র দেশগুলোতে বিকল্প উপায় অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যাতে লোকেরা প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষার অর্থ খুঁজে পায়। বিলুপ্তির হুমকিগ্রস্ত প্রজাতিসমূহকে শিকারের পরিবর্তে পর্যটনের মতো পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে তারা এই প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণের সুফল যাতে অব্যশই ভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবেশ ব্যবস্থা সুরক্ষার লক্ষ্যে অনেক বহুপাক্ষিক সমঝোতা গঠিত হয়েছে ; কিন্তু এসব চুক্তিসমূহের বাস্তবায়ন ও কার্যকর প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা রয়ে গিয়েছে। ওজোনস্তর হ্রাস বিষয়ক মনট্রিল প্রোটোকলের মত অন্যতম সফল একটি পরিবেশ বিয়ষক চুক্তিতে এর বিরোধিতাকারীর বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বিধান রয়েছে এবং এই চুক্তির অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFCs) উৎপাদন বন্ধ করার জন্যে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে ; এই CFC হলো ওজোনস্তর ধ্বংসকারী প্রধান উপাদান। ১৯৮৬ সালের CFC-এর সামগ্রিক ব্যবহার ১.১ মিলিয়ন টন হতে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮ সালে ১৫৬০০০ টন-এ দাঁড়িয়েছে এবং এর মূলে রয়েছে প্রধান মনট্রিল প্রোটোকলের ভূমিকা।

আবার অন্যদিকে দেখা যায়, অধিকাংশ পরিবেশ বিষয়ক চুক্তি বা কনভেনশনের কার্যকর প্রয়োগ বিধি অনুপস্থিত বা এব্যাপারে তহবিল প্রদান একেবারেই অপ্রতুল। অতিমাত্রায় মৎস আহরণ ও বনায়ন ধ্বংস রোধ করার জন্যে কার্যকর বিধি-বিধান ও আইনগত প্রয়োগনীতি প্রয়োজন এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব সীমিত রাখার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আবশ্যক। প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থা সুরক্ষা টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যদি আমরা এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবস্থাকে, যার উপরই মূলত মানব প্রজাতি নির্ভরশীল, অবক্ষয়ের হাত হতে বাঁচাতে চাই, তবে কেবল চুক্তি গঠনই নয়, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাও আবশ্যক।